‘হিরোজ অব ইসলাম’ সিরিজের অনুবাদ

উম্মাহর কিংবদন্তিরা

অনুবাদ ও সংকলন
মুহাম্মাদ আম্মারুল হক

সন্দীপন
প্রকাশন লিমিটেড

সূচিপত্র

১. ফিক্বহের দিকপাল
ইমাম আজম আবূ হানিফা ﵀ ৯

২. হিজরত-ভূমের ইমাম
ইমাম মালিক ইবনু আনাস ﵀ ৩৩

৩. ইলম, হাজ্জ, ও জিহাদের শাইখ
ইমাম আবদুল্লাহ্ ইবনুল মুবারাক ﵀ ৫৪

৪. যুগের ত্রাতা
শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়্যা ﵀ ৭৫

৫. ক্রুসেডের চেয়েও বিশাল
সুলতান সালাহ্ উদ্দীন আইয়ুবী ﵀ ৯৯

৬. মঙ্গোল-বিনাশী বীর
সুলতান মুযাফফর সাইফ উদ্দীন কুতুয ﵀ ১০৮

৭. হাদীসে বর্ণিত বিজেতা
সুলতান মুহাম্মাদ আল ফাতিহ্ ﵀ ১১৮

৮. বিপ্লবের অগ্রসেনা
সাইয়িদ কুতুব শহীদ ﵀ ১৩৭

৯. বিশ্বজিহাদের পথিকৃৎ
শাইখ আবদুল্লাহ্ ইউসুফ আযযাম ﵀ ১৬২

১০. উৎসাহদাতা ঘোড়সওয়ার
তামিম আল আদনানী ﵀ ১৭৮

অনুবাদকের কথা

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره, ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له, ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তাআলার, যিনি আমাকে এই মহৎ কাজ করার তাওফীক দান করেছেন। তিনিই আমাকে ইসলামের বীরদের বীরত্বগাঁথা সংবলিত সিরিজ 'হিরোজ অব ইসলাম'-এর অনুবাদ সম্পন্ন করার শক্তি ও তাওফীক দিয়েছেন। আলহামদুলিল্লাহ, সুম্মা আলহামদুলিল্লাহ।

প্রিয় পাঠক, আমাদের রয়েছে সমৃদ্ধ ইতিহাস; আছে বিজয়ের গৌরবগাঁথা। আমরা এমন এক সময় অতিবাহিত করে এসেছি, যখন মুসলিম মায়েরা তাঁদের সন্তানদের ঘুমপাড়ানি গল্পে শোনাতেন খালিদ-মুসান্নার বিজয়ের কথা। আমাদের ওপর দিয়ে বয়ে গেছে কত ঝড়ঝাপটা, কত দুঃখ। পৃথিবীর ইতিহাসের কত কত ক্ষমতাশালী আমাদের মিটিয়ে দিতে চেয়েছে। কিন্তু তারাই কালের গর্ভে হারিয়ে গেছে। আমাদের চিরস্থির মেরুদণ্ড একটুও বেঁকে যায়নি। মরুভূমির ধুলোঝড়ের মাঝে জেগে থাকা চারা যেমন প্রবল বাতাসের ঝাপটায়ও সোজা থাকার প্রাণপণ প্রচেষ্টা চালিয়ে যায়, ঠিক তেমনিভাবে আমাদের দুঃসময়ে কিছু বীরের জন্ম হয়েছিল, কোনো ঝড়ের সামনে এতটুকু মাথা নোয়াননি যারা। আমরা আজ তাঁদের শৌর্যবীর্যের গল্প শুনি। দ্বীন, ঈমান, আমল, ইলম, জিহাদ, তাযকিয়া সর্বক্ষেত্রে যারা দ্যুতি ছড়িয়েছেন। তাঁদের মধ্যে কেউ বহু শতাব্দী আগে গত হয়েছেন। কেউ-বা আমাদের খুব নিকটতম সময়ের।

পাঠক, ইসলামের ইতিহাসে বীরত্বের গল্প ভুরিভুরি। কত নাম না-জানা মর্দে মুমিনরা আল্লাহর জন্য সর্বস্ব দিয়েছে। সবার কথা আলোচনা করতে গিয়ে ইতিহাসবিদরা রচনা করে গেছেন পাতার পর পাতা। আমাদের আয়োজন তাঁদের মধ্য থেকে ক'জনের কর্মময় জীবনের আলোচনা। আমরা তাঁদের সবার কথা জানব, তাঁদের সকলকে ধারণ করব।

শ্রুতি অনুবাদ, তারপর আবার অনুলিখন কষ্টসাধ্য বটে, তবে চেষ্টার কোনো কমতি রাখা হয়নি। প্রতিটি লেকচারকে সংযোজন-বিয়োজন করে পরিমার্জিত রূপ দেয়া হয়েছে, যেন পাঠকের তৃষ্ণা মেটে। তবুও মানুষের ভুলভ্রান্তি রয়ে যায়। তাই কোনো ভুলভ্রান্তি পরিলক্ষিত হলে দয়া করে আমাদের জানাবেন, সহৃদয় পাঠকের কাছে এই কামনা রইল। আল্লাহ তাআলা সকলের সর্বাঙ্গীন কল্যাণ করুন। আমীন।

অনুবাদক
মুহাম্মাদ আম্মারুল হক

ফিক্বহের দিকপাল

ইমাম আজম আবূ হানিফা ﵀

উম্মাহর মাঝে ইলম, যুহদ, কুরবানির কৃতিত্বের বহুমুখী সাক্ষর রেখে গেছেন ইমাম আজম আবূ হানিফা (রহিমাহুল্লাহ)। তিনি হিজরি সনের আশিতম বর্ষে (খ্রিষ্টীয় ৬৯৯ সনে) জন্মগ্রহণ করেন। জন্মস্থান ইরাকের কুফা। হানাফি ফিক্বহ আজ গোটা মুসলিম বিশ্বের অর্ধাংশ জুড়ে অনুসৃত হয়।

ইমাম আবূ হানিফার মূল নাম নুমান ইবনু সাবিত। আবূ হানিফা তাঁর কুনিয়াত বা উপাধি। 'আবূ হানিফা' শুনে অনেকেই মনে করেন যে, তাঁর কোনো কন্যা সন্তানের নাম হানিফা ছিল। সেখান থেকেই বুঝি আবূ হানিফা এসেছে। আবূ হানিফা অর্থ হানিফার বাবা। কিন্তু আবূ হানিফার এই নামে কোনো সন্তান ছিল না। এটা স্রেফ তাঁর উপাধি। 'হানিফ' শব্দের অর্থ হলো একনিষ্ঠ, খাঁটি। যেমন কুরআনে ইরশাদ হয়েছে,

ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٢٣﴾

তারপর আমি আপনার প্রতি ওহি নাযিল করলাম যে, আপনি একনিষ্ঠভাবে ইবরাহীমের মিল্লাত (আদর্শ) অনুসরণ করুন; এবং তিনি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না।[১]

[১] সূরা নাহল, ১৬ : ১২৩।

অনারব ইমাম

ইমাম আবূ হানিফার (রহিমাহুল্লাহ) একটি উল্লেখযোগ্য দিক হলো, তিনি আরব ছিলেন না। তৎকালীন বহু ইসলামি ব্যক্তিত্ব ছিলেন অনারব। কেউ কেউ ছিলেন বাহির থেকে আসা দাস পরিবারের সদস্য। তবে ইমাম আবূ হানিফার ব্যাপারটা আলাদা।

তাঁর পিতা সাবিত ছিলেন খুবই ধনী ব্যক্তি। সাবিতের পিতা ইবরাহিমের সাথে হযরত আলির (রাদিয়াল্লাহু আনহু) খুব ভালো সম্পর্ক ছিল। কথিত আছে যে, ইবরাহিম তার পুত্রকে আলির কাছে নিয়ে গিয়ে বলেছিলেন,

‘আমার এবং আমার ছেলের জন্য দুআ করে দিন।’

তা-ই করেন হযরত আলি (রাদিয়াল্লাহু আনহু)। ইবরাহীমের পরিবারের জন্য বারাকাহ’র দুআ করেন। এও কথিত আছে যে, ইবরাহীমের বংশে ইমাম আবূ হানিফার জন্ম আসলে হযরত আলি রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর দুআর ফসল।

সাহাবি-সান্নিধ্য

প্রজন্মের দিক দিয়ে ইমাম আবূ হানিফা একজন তাবিয়ি। তাবিয়ি বলা হয় তাঁদেরকে, যারা অন্তত একজন সাহাবির সরাসরি সাক্ষাৎ লাভ করেছেন। ইমাম আবূ হানিফার সাথে সাক্ষাৎ হয়েছিল আনাস ইবনু মালিকের (রাদিয়াল্লাহু আনহু)। তিনি হিজরি ৯৩ সনে ইন্তিকাল করেন।

বালক বয়সেই আনাসের সাক্ষাৎ পান আবূ হানিফা। হযরত আনাস ইবনু মালিক ছিলেন আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খাদেম। তাঁকে ‘খাদিমু রাসুলিল্লাহ’ বলা হয়। যখন আল্লাহর রাসুল মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনায় আসেন, তখন আনাস দশ বছরের ছোট্ট বালক। তাঁর মা তাঁকে রাসুলুল্লাহর কাছে খাদেম হিসেবে দিয়ে এসেছিলেন।

সেইসাথে আনাস ইবনু মালিক (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হাদীস বর্ণনাকারীদের মধ্যেও অন্যতম। কারণ, তিনি দীর্ঘ হায়াত লাভ করেছেন। একশ বছরেরও বেশি। তিনি

নিজের সম্পর্কে বলতেন,

‘এই মুহূর্তে জীবিত ব্যক্তিদের মধ্যে একমাত্র আমিই আছি, যে দুই কিবলা সামনে নিয়ে সালাত পড়তে পেরেছে।’

দুই কিবলা মানে মাসজিদুল আক্বসা ও মাসজিদুল হারাম। সাহাবিদের মধ্যে যারা দুনিয়া থেকে একদম শেষে বিদায় নিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে তিনিও একজন। এছাড়াও আল্লাহর রাসুল ﷺ-এর দুআর বারাকাহ লাভের কারণে একশজনের অধিক সন্তানসন্ততি ছিল তাঁর। যেহেতু তিনি দীর্ঘ হায়াত পেয়েছেন, তাই বহু তাবিয়ি তাঁর কাছ থেকে ইলম শিখেছেন, হাদীস নিয়েছেন। দুই হাজারের অধিক হাদীস বর্ণনা করেছেন তিনি। মানুষকে প্রায়ই বলতেন,

يا بَنِيَّ ! قَيِّدوا العِلمَ بالكِتابِ

‘বাবারা, কিতাবের মধ্যে ইলমকে লিখে রেখো।‘

এভাবেই তিনি গ্রন্থ রচনার মাধ্যমে ইলম সংরক্ষণের প্রতি গুরুত্ব দিতেন। ইমাম আবূ হানিফার ক্ষেত্রেও তা-ই করেছেন তিনি।

আসলে আমাদের সালাফগণ এমনই সচেতন ছিলেন। শুনে শুনে শেখার সময় সবই লিখতে হবে তা নয়, কিন্তু মূলকথাগুলো লিখে নেয়াই উচিত। এটি ভালো করে জানতেন তাঁরা। লিখে নেয়ার উদ্দেশ্য হলো জ্ঞানকে সংরক্ষণ করা। পরবর্তী সময়ে মুখস্থ করাও সহজ হয় তাতে।

লোকে যারে ভালো বলে

ইদানীং কেউ কেউ ইমাম আবূ হানিফার (রহিমাহুল্লাহ) প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে। তাঁকে নিয়ে ভুল ধারণাও আছে অনেকের। এটি ঠিক যে, বহু সালাফ ইমাম আবূ হানিফার সাথে বিভিন্ন বিষয়ে মতানৈক্য রাখতেন। কিন্তু ইমামের ফিক্বহি পাণ্ডিত্য সম্পর্কে উঁচু ধারণা ছিল সবারই।

সুফিয়ান আস সাওরী (রহিমাহুল্লাহ) ছিলেন ইমাম আবূ হানিফার সমসাময়িক। তিনিও কুফায় বসবাস করতেন। তো একবার তাঁর এক শাগরেদকে কোথাও থেকে

আসতে দেখে প্রশ্ন করলেন,

'কোথা থেকে আসছ?'

সে বলল, 'ইমাম আবূ হানিফার মজলিস থেকে।'

তখন সুফিয়ান বললেন,

لقد جئت من عند أفقه أهل الأرض

'নিঃসন্দেহে পৃথিবীর সবচেয়ে জ্ঞানী ব্যক্তির কাছ থেকে এসেছ তুমি।'[২]

কিছু বোকা লোক বলে যে, ইমাম আবূ হানিফা হাদীস জানতেন না। এটা সম্পূর্ণ ভুল কথা। তিনি ইলমে দ্বীনের সার্বিক শাখায় পণ্ডিত ছিলেন। আর হাদীস জানা ব্যতীত ফিক্বহের বুৎপত্তি অর্জন করা অসম্ভব।

ইমাম আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারাক (রহিমাহুল্লাহ) হলেন ইমাম আবূ হানিফার ছাত্র। তিনি তাঁর ওস্তাদ ইমাম আবূ হানিফাকে আল্লাহর একটি নিদর্শন বলতেন। তিনি বলেন,

رأيت أعبد الناس، ورأيت أورع الناس، ورأيت أعلم الناس، ورأيت أفقه الناس

'আমার দেখা মানুষদের মাঝে তিনি সবচেয়ে ইবাদতগুজার, সবচেয়ে পরহেযগার, সবচেয়ে বেশি ইলমের অধিকারী এবং ফিক্বহের সবচেয়ে বড় পণ্ডিত।'[৩]

তিনি আরও বলেন,

اما أعبد الناس فعبد العزيز بن أبي رواد وأما أورع الناس فالفضيل بن عياض وأما أعلم الناس فسفيان الثوري وأما أفقه الناس فأبو حنيفة ثم قال ما رأيت في الفقه مثله

[২] তারীখে বাগদাদ (১৩/৩৪৪), তাবয়ীযুয সহিফাহ ফি মানাক্বিবি আবী হানিফা (১০৪), তাযহিবু তাহযিবিল কামাল ফি আসমাঈর রিজাল

[৩] কিতাবু মাআনিল আখয়ার ফি শারহি আসামি রিজালি মাআনিল আসার-বদরুদ্দীন আইনী

‘আমার দেখা সবচেয়ে বেশি ইবাদতগুজার আবদুল আজিজ ইবনু আবী দাউদ, সবচেয়ে বেশি আল্লাহভীরু ফুযাইল ইবনু আয়ায, সবচেয়ে বেশি ইলমের অধিকারী সুফিয়ান আস সাওরী, ফিক্বহের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি পণ্ডিত ইমাম আবূ হানিফা।’[৪]

তিনি আরও বলেন,

وما رأيت أحدا قط تكلم في الفقه أحسن من أبي حنيفة

‘ফিক্বহ নিয়ে ইমাম আবূ হানিফার চেয়ে সুন্দর করে আর কাউকে বলতে দেখিনি।’[৫]

ইমাম আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারাক নিজেও ইলমে হাদীসের কিংবদন্তি। তিনিও ইমাম আবূ হানিফার ফিক্বহী পাণ্ডিত্য স্বীকার করে নিয়েছেন।

আব্দুল্লাহ ইবনু দাউদ (রহিমাহুল্লাহ) ইমাম আবূ হানিফা সম্পর্কে বলেছেন,

يجب على أهل الإسلام أن يدعو الله لأبي حنيفة في صلاتهم وذكر حفظه عليهم السنن والفقه

‘সালাতে আল্লাহর নিকট আবূ হানিফার জন্য দুআ করা মুসলিমদের কর্তব্য।’ এরপর সুন্নাহ ও ফিক্বহ সংরক্ষণের মাধ্যমে আবূ হানিফা মুসলিম উম্মাহর কতটা উপকার করেছেন, এ প্রসঙ্গে আলোচনা তুলে ধরেন তিনি।[৬]

ইমাম যাহাবি (রহিমাহুল্লাহ) সিয়ারু আলামিন নুবালা গ্রন্থে ইমাম আবূ হানিফাকে আদমের (আলাইহিস সালাম) শ্রেষ্ঠ সন্তানদের একজন বলেছেন।

ফুযাইল ইবনু আয়ায (রহিমাহুল্লাহ) ইমাম আবূ হানিফা (রহিমাহুল্লাহ) সম্পর্কে বলেন,

ان أبو حنيفة رجلاً فقيهاً معروفاً بالفقه، واسع المال، معروفاً بالأفاضل على

[৪] সিয়ারু আলামিন নুবালা, তারীখে বাগদাদ

[৫] তাহযিবুল আসমাঈ ওয়াল লুগাত, কিতাবুল আসার, তারীখে বাগদাদ

[৬] (খতীব বাগদাদী, তারীখে বাগদাদ, ১৫/৪৫৯)

كل من يطيف به، صبوراً على تعلم العلم بالليل والنهار، حسن الليل، كثير الصمت، قليل الكلام حتى ترد مسألة في حلال أو حرام، فكان يحسن أن يدل على الحق، هارباً من مال السلطا

‘আবূ হানিফা একজন সুপ্রসিদ্ধ ফকিহ। পাশাপাশি অগাধ সম্পদশালী। নিজের আশপাশের মানুষের জন্য কল্যাণকর কাজ করার জন্য সুপরিচিত ছিলেন। দিবারাত্রি ধৈর্য ধরে ইলম শিখতেন। রাত্রিযাপন করতেন উত্তমভাবে (তাহাজ্জুদ আদায়ের মাধ্যমে)। দীর্ঘক্ষণ চুপ থাকতেন তিনি। হালাল ও হারাম বিষয়ে তাঁর সামনে কোনো মাসআলা উপস্থাপন করার আগপর্যন্ত কথা কমই বলতেন। সব সময় সত্যের পথে উত্তমরূপে থাকতেন। আর পালিয়ে বেড়াতেন শাসকের সম্পদ থেকে।’[৭]

ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ শৈশব

ইমাম আবূ হানিফার যখন জন্ম হয়, তখন মুসলিমরা চরম নির্যাতিত। আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী শাসনব্যবস্থা তখন সত্যিই অত্যাচারীদের হাতে। ন্যায়বিচারবিহীন এক অস্থির সময় চলমান। এ অস্থিরতার শুরু হযরত আলির (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) খিলাফতের তথা হিজরি ৩৪/৩৫ সনের পর থেকেই।

তখন ইরাকের কুফার গভর্নর ছিল হাজ্জাজ বিন ইউসুফ। হাজ্জাজ প্রায় বিশ বছর কুফা শাসন করে। তার অত্যাচারের মাত্রা এত বেশি ছিল যে, তার হাতে সাহাবি পর্যন্ত শহীদ হয়েছেন। কতটা জালিম হলে সাহাবিকে শহীদ করা যায়! হাজ্জাজ তা-ই করেছিল। তার হাতে শহীদ হয়েছেন সাহাবি আবদুল্লাহ ইবনুয যুবাইর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু), প্রখ্যাত তাবিয়ি সাঈদ ইবনুয যুবাইর (রহিমাহুল্লাহ)। আবদুল্লাহ ইবনু উমর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর হত্যার জন্যও দায়ী হাজ্জাজ। হাজ্জাজকে আবদুল্লাহ ইবনু উমর ফাসিক বলেছিলেন। হাজ্জাজ মক্কায় একটি সেনাবাহিনী পাঠায়। এক সৈনিকের বর্শার আঘাত লাগে আবদুল্লাহ ইবনু উমরের পায়ে। সেই ঘায়ের কারণেই ইবনু উমর ইন্তিকাল করেন কয়েকমাস পর।

[৭] উসুলুদ্দিন ইনদা আবী হানিফা

এহেন গোলযোগ ও জুলুমের শাসনের সময় ইমাম আবূ হানিফার (রহিমাহুল্লাহ) জন্ম ও বেড়ে ওঠা। তিনি ছোট থাকতেই ইন্তিকাল করেন তাঁর পিতা। কোনো ইলমী পরিবেশে বেড়ে উঠার সুযোগ পাননি তিনি। অন্যান্য ইমাম ও আলিমগণ ইলম শেখার পরিবেশ তাঁদের ঘরেই পিতামাতার কাছে পেয়েছেন। যেমন ইমাম ইবনু তাইমিয়্যা, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম মালেক (রহিমাহুমুল্লাহ) প্রমুখ তাঁদের পিতামাতার কাছ থেকে সঠিক দিকনির্দেশনা পেয়েছেন। তাঁদেরকে বলা হয়েছে, এটা শেখো, ওটা শেখো। কিন্তু ইমাম আবূ হানিফা পাননি এই পরিবেশ। তবে কুফায় বসবাসরত আলিমগণের সংখ্যাও কম ছিল না। তৎকালীন ইলমের প্রধান কেন্দ্র বলা যেতে পারে কুফাকে।

পিতার ইন্তিকালের পর আবূ হানিফা ব্যবসা শুরু করেন। মূলত কাপড়ের ব্যবসা করতেন তিনি। এটিই ছিল তাঁর পৈত্রিক ব্যবসা।

ইলমের পথে যাত্রা শুরু

আবূ হানিফা তখন বিশ বছরের তরুণ। ইমাম আশ শা'বি রহিমাহুল্লাহ নামে একজন ইলমে দ্বীনের পণ্ডিত ব্যক্তি কুফায় বসবাস করতেন। আশ শা'বি সম্পর্কে ইবনু সিরীন বলেন,

'কুফায় এসে যখন ইমাম আশ শা'বিকে দারস দিতে দেখি, তখনও অনেক সাহাবি জীবিত ছিলেন।'

কত বড় আলিম হলে সাহাবিদের জীবদ্দশাতেও কুফাতে দারস দেওয়া যায়!

ইমাম আবূ হানিফা (রহিমাহুল্লাহ) বলেন,

مررت يوماً على الشعبي وهو جالس، فدعاني وقال: إلى من تختلف؟ فقلت: اختلف إلى فلان. قال: لم أعن إلى السوق، عنيت الاختلاف إلى العلماء. فقلت له: أنا قليل الاختلاف إليهم. فقال الشعبي لـ أبي حنيفة: لا تفعل، وعليك بالنظر في العلم ومجالسة العلماء؛ فإني أرى فيك يقظة وحركة. قال: فوقع في قلبي من قوله، فتركت الاختلاف - يعني: إلى السوق - وأخذت في العلم، فنفعني الله تعالى بقوله

'একবার ইমাম আশ শা'বির মজলিস অতিক্রম করে যাচ্ছিলাম। ইমাম আমাকে

হিজরত-ভূমের ইমাম

ইমাম মালিক ইবনু আনাস رحمه الله

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের অন্যতম একজন ইমাম হলেন ইমাম মালিক ইবনু আনাস (রহিমাহুল্লাহ)। তাঁর উপাধি 'ইমামু দারিল হিজরত', তথা হিজরতের ভূমির ইমাম। হিজরতের ভূমি হলো আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শহর মদীনাতুল মুনাওয়ারাহ। এই শহরের সাথে সম্পর্কিত করে ইমাম মালিক ইবনু আনাসকে ইমামু দারিল হিজরত বলা হয়।

তাঁর পুরো নাম আবূ আবদুল্লাহ মালিক ইবনু আনাস ইবনু মালিক ইবনু আবী আমির ইবনু আমর ইবনু হারিস ইবনু গাইমান ইবনু হুসাইল ইবনু আমর ইবনু হারিস। মদীনা মুনাওয়ারায় হিজরি ৯৩ সনে যিলমারওয়া নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন তিনি। তখন সুলায়মান ইবনু আবদিল মালিকের খেলাফতের সময়কাল। এ বছরই ইন্তিকাল করেন নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খাদেম প্রসিদ্ধ সাহাবি হযরত আনাস বিন মালিক (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)। ইমাম মালিকের পিতা আনাস ইবনু আমের যুদ্ধে ব্যবহারের জন্য তির বানাতেন। এটাই ছিল তাঁর পেশা। তাঁর মাতা ছিলেন আলিয়াহ বিনতে শারিক আল আযদিয়্যাহ। আল্লাহ তাআলা তাঁদের উভয়ের ওপর রহম করুন।

মায়ের বেটা

ইমাম মালিকের (রহিমাহুল্লাহ) মা তাঁকে বালক বয়স থেকেই আলিমদের মতো পোশাক পরাতেন। বর্তমানে যেমন আলিমগণ বিশেষ ধরনের পোশাক পরেন, তখনও এমন চল ছিল। আলিয়াহ (রহিমাহাল্লাহ) চাইতেন তাঁর সন্তানও একজন বড়

আলিম হোক। তাই মালিক ইবনু আনাসকে বালক বয়স থেকেই পাগড়ি, আলখাল্লা পরিয়ে দিতেন তিনি। এটিই আসলে তারবিয়াহ, সঠিক লালনপালন। ইমাম মালিকের ইমাম মালিক হয়ে ওঠার পেছনে তাঁর মায়ের অবদান অনেক।

মজার ব্যাপার হলো, মালিক ইবনু আনাস কিন্তু জীবনের শুরুতে আলিম হতে চাননি। তিনি চেয়েছিলেন গায়ক হতে। মায়ের ইচ্ছে ভিন্ন। তিনি তো চাইলেই ছেলেকে বলতে পারতেন, 'কী! তুই গায়ক হবি? এত বড় সাহস! কিছুতেই এটা হতে দেবো না। জানিস, গান-বাজনা কত খারাপ?' ইত্যাদি ইত্যাদি। ইমাম মালিকও উত্তরে বচসা করতে পারতেন, 'না, তোমার কথা শুনব না। আমি গায়ক হবই।' কিন্তু উভয়ের কেউই তা করেননি।

মালিকের মা তাঁকে বললেন,

'দেখো, গায়কদের চেহারা সুন্দর হতে হয়। গান গাওয়ার সময় শ্রোতারা গায়কের চেহারার দিকে তাকিয়ে থাকে। দেখতে সুন্দর না হলে গানও পছন্দ করে না। তুমি তো সুশ্রী নও। তাই গায়ক হবার চিন্তা বাদ দাও। ইলম শেখো, বড় আলিম হও।' মালিক ইবনু আনাস ভাবলেন, 'হ্যাঁ, কথা তো সত্য। থাক, গানের চিন্তা বাদ দিই। ইলম অর্জন করি।'

গানের প্রতি নিরুৎসাহিত করতে মা অসুন্দর বললেও বাস্তবে কিন্তু ইমাম মালিক অসুন্দর ছিলেন না। সত্যিই সুন্দর ও রূপবান পুরুষ ছিলেন তিনি। তারপরও মায়ের কথা তাঁর মাঝে প্রভাব বিস্তার করে। তাঁর কথা আমলে নিয়ে গান ছেড়ে দেন। মনোনিবেশ করেন ইলম অর্জনে।

এটা আলিয়াহর (রাহিমাহাল্লাহ) প্রজ্ঞার পরিচয়। তিনি রূঢ়ভাবে নিষেধ করার পরিবর্তে এমন কিছু বলেছেন, যা ইমাম মালিকের মাথায় গেঁথে যায়। এরই বদৌলতে আমরা পেয়েছি এক মহান ইমাম। ইসলামের এক মহান সেবক। ইমামু দারিল হিজরত ইমাম মালিক ইবনু আনাস রহিমাহুল্লাহ।

শিক্ষকদের সাহচর্যে

ইমাম মালিক ইবনু আনাস (রহিমাহুল্লাহ) দশ বছর বয়সে ইলম অর্জন করতে শুরু করেন। প্রায় নয়শ মুহাদ্দিস থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন তিনি। ইমাম যাহাবির (রহিমাহুল্লাহ) সিয়ারু আলামিন নুবালা-সহ আরও যত জীবনীগ্রন্থ আছে, সেখানে ইমাম মালিকের বহু শিক্ষকের নাম আছে, আবার অনেকের নেই। কিন্তু সব মিলিয়ে সংখ্যাটা এমনই হবে। এর মধ্যে প্রসিদ্ধ কয়েকজন হলেন :

ইমাম আবূ হানিফা, ইমাম আল আওযায়ী, ইমাম সুফিয়ান আস সাওরি, ইমাম সুফিয়ান ইবনু উয়াইনাহ, ইমাম আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারাক (রহিমাহুমুল্লাহ)। উল্লেখিত সকলেই ইমাম মালিক ইবনু আনাসের সমসাময়িক।

ওস্তাদ ইবনু হরমুজ

ইমাম মালিকের অনেক শিক্ষকের মধ্যে একজন বিশিষ্ট শিক্ষক ছিলেন ইবনু হরমুজ (রহিমাহুল্লাহ)। উল্লেখ্য, ইলম শেখার একটি সার্বজনীন মূলনীতি আবহমানকাল থেকে চলে আসছে। ইসলামি ব্যক্তিত্ব ও আলেমগণের ইতিহাসে পাওয়া যায় এই মূলনীতিটি। তা হলো,

باب الشيخ لا يطرق

‘শাইখের দরজায় টোকা দেয়া যাবে না।’

অর্থাৎ, শিক্ষকের কাছে গিয়ে সরাসরি তাঁর দরজার কড়া নাড়া আদবের খেলাফ। শিক্ষককে ডেকে বাইরে আনা যাবে না। তিনি নিজের সময়মতো বেরিয়ে এসে ইলম বিতরণ শুরু করবেন। বর্তমানে ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্কে আদব নামক বিষয়টিই হয়ে গেছে অপ্রাসঙ্গিক। সে যুগে ইলম অর্জন করতে কোনো শায়খের কাছে গেলে আদবই ছিল মুখ্য।

যেমন আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) যখন হাদীস সংগ্রহ করতে অন্যান্য বয়স্ক সাহাবির কাছে যেতেন, তখন কখনোই নিজ থেকে তাঁদেরকে

ডাকতেন না। বসে থাকতেন দরজায়। দুষ্ট বালকেরা তাঁর গায়ে মুখে মাটি, ধুলোবালি ছুড়ত। তিনি সফর করে ধূলিধুসরিত মুখ নিয়ে অপেক্ষা করতেন কখন সাহাবি বেরিয়ে আসবেন এবং তিনি হাদীস জেনে নিবেন।

ইমাম মালিকও ছিলেন এই মূলনীতির অনুসারী, সেই দশ বছর বয়স থেকেই।

শীতকালে মদীনা মুনাওয়ারাহ প্রবল হিমবাতাসের কারণে জমে পাথর হয়ে যায়। শৈত্যপ্রবাহের কারণে বাইরে বের হওয়া দায়। এর মাঝেও ইমাম মালিক ভোরে ইবনু হরমুজের দরজায় ঠায় দাঁড়িয়ে রইতেন। এমনই ছিল তাঁর আদব। ইমাম মালিক নিজেই বলেন,

وكان يقول: وكنت آتي ابن هرمز بكرة فما أخرج من بيته حتى الليل.

'আমি ভোরে ইবনু হরমুজের কাছে আসতাম। রাত অবধি বের হতাম না তাঁর বাড়ি থেকে।'[১৮]

তিনি আরও বলেন, 'ইবনু হরমুজের ঘরের সামনে ঠান্ডা পাথরে বসে থাকতাম আমি। পায়জামা পাথরের হিমে ভিজে যেত। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে অপেক্ষায় থাকতাম কখন ইবনু হরমুজ সালাতের জন্য কিংবা অন্য কোথাও যেতে বের হয়ে আসবেন, আর আমি ইলম অর্জন করব সেই সুযোগে।'

বয়সকালে অন্ধ হয়ে যান ইবনু হরমুজ। তখন ইমাম মালিক তাঁকে ঘর থেকে মাসজিদে আনা-নেওয়া করতেন। আরও যেখানে যাওয়া প্রয়োজন হতো, সেখানেও নিতেন। ইলম অর্জনের জন্য এই ঘনিষ্ঠ সাহচর্যের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করেছেন ইমাম মালিক। আনা-নেওয়ার সময়টুকু নানা বিষয়ে প্রশ্ন করে উত্তর জেনে নিতেন।

[১৮] তারতিবুল মাদারিক ওয়া তারকিবুল মাসালিক (৩২/১)

ওস্তাদ আন নাফে

ইমাম মালিকের আরেকজন শিক্ষক আন নাফে (রহিমাহুল্লাহ)। তিনি আবদুল্লাহ ইবনু উমরের (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর) আজাদকৃত গোলাম। আন নাফের একটা বৈশিষ্ট্য ছিল অযথা কারও সাথে কথা না বলা। দারসগাহের বাইরে কারও কোনো প্রশ্নেরও উত্তর দিতেন না তিনি। দারসের সময় নির্ধারিত, স্থান নির্ধারিত। কিছু জানতে হলে ওইটুকু সময়ের মধ্যে দারসগাহতেই জেনে নিতে হবে। কোনো কারণে আসতে না পারলে অপেক্ষা করতে হবে পরবর্তী দারসের জন্য। সময় শেষ মানে সোজা বাড়িতে। খানিকটা বদমেজাজিও ছিলেন আন নাফে।

স্বভাবতই আন নাফের দারসগাহে সব সময়ই ভিড় লেগে থাকত। শত শত হাজার হাজার শিক্ষার্থী, ভক্ত ঘিরে রাখত তাঁকে। তাঁর কাছাকাছি যাওয়ার সাধ্য ছোট্ট বালক ইমাম মালিকের হতো না; বরং ভিড়ে ঢুকলে হারিয়েই যাবেন তিনি। ওদিকে আন নাফে দারসগাহের বাইরে কথাও বলতেন না। তাই ইমাম মালিক একটি বুদ্ধি আঁটলেন। আদবের পরিপন্থি কোনো ফন্দি নয়, এই বুদ্ধি ইলম অর্জনের বুদ্ধি।

আন নাফেকে ধরতে তাঁর বাড়ির সামনে বসে থাকতেন ইমাম মালিক। সকালে ঠান্ডা হলেও দুপুর হতে হতে মরুভূমির বালি তেতে ওঠত। আবহাওয়া হয়ে যেত খুবই রুক্ষ। প্রচণ্ড তাপদাহে অশান্ত হয়ে যেত মদীনা মুনাওয়ারাহ। যোহরের সময় সেই প্রচণ্ড গরমেও ইমাম মালিক বসে থাকতেন নাফের গৃহের সামনে। ইমাম মালিক (রহিমাহুল্লাহ) বলেন,

كنت آتي نافعا نصف النهار وما تظلني الشجرة من الشمس ، أتحين خروجه فإذا خرج أدغه ساعة كأني لم أره ، ثم أتعرض له فأسلم عليه وأدعه ، حتى إذا دخل أقول له : كيف قال ابن عمر في كذا وكذا ، فيجيبني ، ثم أحبس وكان فيه حدة ".

'আমি দুপুরের দিকে নাফে এর কাছে আসতাম। গাছের ছায়াও পেতাম না প্রখর রোদে। বসে থাকতাম কখন মাসজিদে যেতে বের হবেন তিনি। তিনি সালাতের জন্য বের হলে আমি পেছনে পেছনে এমনভাবে চলতাম, যেন তাঁকে দেখিইনি। তাঁকে বুঝতে দিতাম না যে, অনুসরণ করছি। স্বাভাবিকভাবেই যেতাম। এরপর

এগিয়ে গিয়ে সালাম দিয়ে ছেড়ে দিতাম। তিনি মাসজিদে ঢোকার পর গিয়ে বলতাম, "আচ্ছা, অমুক-অমুক বিষয়ে আবদুল্লাহ ইবনু উমর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) কী বলেছেন?" তিনি একটি প্রশ্নের উত্তর দিলেই একেবারে জেঁকে ধরতাম তাঁকে। আর তাঁর মধ্যে ছিল ক্ষুরধার মেধা।'[১৯]

সালাম দিলে তো যে কেউই উত্তর দেবে। যতই কথা না বলুক, সালাতের পর মাসজিদ থেকে বেরিয়ে কেউ সালাম দিয়ে অবস্থা জিজ্ঞেস করলে উত্তর দেওয়া স্বাভাবিক। ইমাম মালিকের বুদ্ধিটা ছিল এখানেই। সালামের উত্তর পেলে কথায় কথায় বলে বসতেন, 'শায়খ, একটা হাদীসের কথা বলেছিলেন। একটা প্রশ্ন এসেছে মনে।' অথবা, 'শায়খ, এই মাসআলার সমাধান কী?' স্বাভাবিক কথার তালেই উত্তর দিয়ে যেতেন আন নাফে (রহিমাহুল্লাহ)। ওদিকে ইমাম মালিকেরও উদ্দেশ্য হাসিল হয়ে গেল।

ওস্তাদ ইবনু শিহাব আয-যুহরি

ইমাম ইবনু শিহাব আয-যুহরি (রহিমাহুল্লাহ) ছিলেন ইমাম মালিকের (রহিমাহুল্লাহ) আরেকজন হাদীস-শিক্ষক। আয-যুহরির ওখানেও সব সময় ভিড় লেগে থাকত। ইমাম মালিক একা পেতেন না তাঁকে। তাই এখানেও একটি বুদ্ধি খাটালেন তিনি। একবার ঈদের দিনে তিনি ইমাম ইবনু শিহাব আয-যুহরির সাথে সাক্ষাৎ করতে যান।

সাধারণত আমাদের ঈদের দিন কাটে আনন্দ-ফূর্তি করে। আগের রাত থেকে চলে প্রস্তুতি। সকালে নতুন জামা পরে সুগন্ধি লাগিয়ে মাসজিদে যাই। বাড়িতে ফিরে এসে খোশগল্পে মত্ত হই সকলের সাথে। খাবার দাবার গ্রহণ করি। এটাই ঈদের দিনের আনন্দ। কিন্তু ইমাম মালিক ইবনু আনাস অন্য ধাতুতে গড়া।

ইমাম মালিক ইবনু আনাস নিজেই বর্ণনা করেন,

قال قلت : شهدت العيد فقلت : هذا يوم يخلو فيه ابن شهاب فانصرفت من المصلى حتى جلست على بابه ، فسمعته يقول لجاريته : انظري من في الباب . فنظرت ، فسمعتها تقول مولاك الأشقر مالك . قال أدخليه فدخلت ، فقال :

[১৯] আদ দিবাজ আল মাযহাব (১১৭)

ما أراك انصرفت بعد إلى منزلك ! قلت : لا . قال : هل أكلت شيئا . قلت : لا . قال : اطعم قلت لا حاجة لي فيه . قال فما تريد ؟ قلت تحدثني . قال لي هات. فأخرجت ألواحي فحدثني بأربعين حديثا.قلت زدني . قال : حسبك إن كنت رويت هذه الأحاديث فأنت الحفاظ . قلت : قد رويتها . فجذب الألواح من يدي ثم قال : حدث . فحدثته بها . فردها إلي وقال : فقلت :فردها الي وقال قم فأنت من أوعية العلم

‘ঈদের দিন সালাতে উপস্থিত হয়ে ভাবলাম, আজকের এই দিনে নিশ্চয়ই কেউ ইমাম ইবনু শিহাবের দারসে যাবে না। তাই সালাতের পরপরই চলে গেলাম তাঁর বাড়ি। গিয়ে দরজায় টোকা না দিয়ে বাড়ির সামনে বসে অপেক্ষা করতে লাগলাম। শুনতে পেলাম ইমাম ইবনু শিহাব তার দাসীকে বলছেন, “বাইরে কে এসেছে, দেখো তো।’ বলা হলো, “মালিক ইবনু আনাস এসেছে।” এরপর ইমাম আয যুহরি দাসীকে পাঠিয়ে আমাকে ভেতরে ডেকে নিলেন। বললেন, “তোমাকে তো সালাতের পর বাড়ি যেতে দেখলাম না। খাওয়া-দাওয়া করেছ?”

“জি না, খাইনি।”, বললাম আমি।

তিনি আমার জন্য খাবার আনালে আমি বললাম, “আমি তো এখানে খেতে আসিনি।”

“তা হলে?”

تحدثني

“আমাকে হাদীস বর্ণনা করে শোনান।”

“ঠিক আছে, এসো।”

স্লেট বের করলাম আমি। এরপর ইমাম ইবনু শিহাব আয যুহরি আমাকে চল্লিশটি হাদীস সনদ সহকারে শেখালেন। শেষ হওয়ার পর বললাম,

زدني

“আরও কিছু হাদীস বলুন।”

তিনি আমাকে বললেন, “যদি এই চল্লিশটি হাদীস স্মরণে রাখতে পারো, তা হলে তুমি হাফিজুল হাদীস।” আমি বললাম যে, “আমার মুখস্থ হয়ে গেছে।” ইবনু শিহাব আমার হাত থেকে স্লেট নিয়ে বললেন, “দেখি, শোনাও তো।” সবগুলো হাদীস মুখস্থ শোনালাম আমি। এরপর তিনি আমার স্লেট ফিরিয়ে দিয়ে বলে উঠলেন, “ওঠো, তুমি একজন জ্ঞানপাত্র।”’[২০]

ইমাম ইবনু শিহাবের জন্য সেটি ছিল এক আশ্চর্যজনক অভিজ্ঞতা। ঈদের দিন সবাই যেখানে আনন্দ করছে, নতুন জামাকাপড় পরে ঘুরছে, ভালো ভালো খাবার খাচ্ছে, সেখানে এই অল্পবয়সি ছেলেটি তাঁর কাছে এসেছে হাদীস শেখার জন্য। ঈদের সালাত আদায় করে বাড়িতেও যায়নি, খাবার দিলেও খায়নি।

নিজ যোগ্যতার পূর্ণ সদ্ব্যবহার

আমাদের সবার মধ্যেই এমন কিছু না কিছু যোগ্যতা থাকে, যা আমাদের একেবারে স্বকীয়। কিন্তু প্রশ্ন হলো, আমরা সেটা কোথায় প্রয়োগ করি। কারও হয়তো মেধা ভালো, কিন্তু শারীরিকভাবে দুর্বল। আবার কারও হয়তো শক্তসমর্থ শরীর, কিন্তু মেধাশক্তি কম। আবার কারও মেধা কম, কিন্তু অনুধাবন করার ক্ষমতা ও যুক্তিবোধ ভালো। যা-ই হোক না কেন, প্রশ্ন হলো এ যোগ্যতা কোথায় ব্যবহৃত হচ্ছে। ইমাম মালিক ইবনু আনাস (রহিমাহুল্লাহ) তাঁর যোগ্যতা কোথায় ব্যবহার করেছেন, তা দেখা যাক।

মাত্র ২১ বছর বয়সে ফতোয়া দেওয়ার যোগ্যতায় উপনীত হন ইমাম মালিক। কুরআন ও হাদীস থেকে গবেষণা করে মানবজীবনের কোনো সমস্যার সমাধান বা প্রশ্নের উত্তর দেওয়াকে ফতোয়া বলে। সুদীর্ঘ ইলমসাধনা ও অধ্যবসায়ের পর এই সম্মান অর্জিত হয়। একুশ বছর বয়সে সে যোগ্যতা লাভ করা রীতিমতো অকল্পনীয়।

ইমাম মালিকের যোগ্যতা কত বিস্তৃত ছিল, তা আমরা একটি হাদীস থেকে বুঝতে

[২০] তারতিবুল মাদারিক ওয়া তাকরিবুল মাসালিক

পারি। হযরত আবূ হুরায়রা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণনা করেন, আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন,

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال : «ليضربن الناس أكباد الإبل في طلب العلم، فلا يجدون عالما أعلم من عالم المدينة »

'অতি অবশ্যই মানুষ দূর-দূরান্ত থেকে ইলম অন্বেষণে আসবে। মদীনার আলিমের চেয়ে জ্ঞানী আর কোনো আলিম খুঁজে পাবে না তারা।'[২১]

এই হাদীস সম্পর্কে সুফিয়ান ইবনু উয়াইনাহ (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন,

إنه مالك بن أنس

'হাদীসে উদ্ধৃত এই ব্যক্তি নিঃসন্দেহে মালিক ইবনু আনাস।'[২২]

কারণ, তখন ইলমের দিক থেকে মদীনা মুনাওয়ারায় ইমাম মালিক ইবনু আনাসের সমকক্ষ কেউই ছিল না। তিনিই ছিলেন মদীনার শ্রেষ্ঠ আলিম। ইমাম আশ শাফেঈ (রহিমাহুল্লাহ) বলেন,

لولا مالك وسفيان لذهب علم الحجاز

'মালিক ও সুফিয়ান ইবনু উয়াইনাহ না থাকলে হিজায থেকে ইলম চলে যেত।'[২৩]

হিজায বলতে আরব উপদ্বীপকে বোঝায়। মক্কা-মদীনাসহ এর আশপাশের স্থানসমূহ মিলে মূল হিজাযের ভূমি।

ইয়াহইয়া ইবনু মায়ীন (রহিমাহুল্লাহ) বলেন,

كان مالك من حجج الله على خلقه

'ইমাম মালিক আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে সৃষ্টিজগতের ওপর প্রমাণস্বরূপ।'[২৪]

---

[২১] তিরমিযি, ২৬৮০

[২২] তুহফাতুল আওয়াযি, মা রাওয়াহুল আকাবির আন মালিক

[২৩] তারতিবুল মাদারিক ওয়াতাক্বরিবুল মাসালিক (১/৩৬)

[২৪] আল ইনতিকা ফি ফাযায়িলিস সালাসাতিল আইম্মাহ (৩১), মাওয়াহিবুল জালীল (১/৩৫)

অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা তাঁর ইলমকে ইমাম মালিক ইবনু আনাসের মাধ্যমে পৃথিবীতে প্রমাণ হিসেবে রেখেছেন।

ইমাম মালিক ইবনু আনাস (রহিমাহুল্লাহ) নিজের সম্পর্কে বলেন,

"ما جلست حتى شهد لي سبعون شيخا من أهل العلم أني موضع لذلك"

'আমি যে ফতোয়া প্রদানের উপযুক্ত, এই মর্মে সত্তরজন আলিম সাক্ষ্য দেওয়ার আগপর্যন্ত আমি ফতোয়া দিতে বসিনি।'[২৫]

যোগ্যতা আরও আগেই লাভ করেছিলেন তিনি। কিন্তু তা সত্ত্বেও অপরাপর উলামাগণের সাক্ষ্যের জন্য অপেক্ষা করেছেন। হুট করে ফতোয়া দিতে বসে যাননি। বর্তমানের অস্থিরমনস্ক ফতোয়াবাজদের জন্য এ এক দারুণ শিক্ষা।

স্বর্ণালি সূত্র

ইমাম মালিক ইবনু আনাসের (রহিমাহুল্লাহ) সনদে বর্ণিত হাদীসকে সবচেয়ে বিশুদ্ধ সনদ ধরা হয়। 'মুসতালাহুল হাদীস' তথা হাদীসশাস্ত্রের পরিভাষায় 'সিলসিলাতুস যাহাব' বলে একটি কথা আছে। এর অর্থ 'স্বর্ণ সনদ'। অর্থাৎ, এর চেয়ে বিশুদ্ধ বর্ণনাসূত্র আর হয় না।

আমরা জানি, কুরআনের পর সবচেয়ে বিশুদ্ধ গ্রন্থ সহিহ আল বুখারি। সেই বুখারিতেও কিছু হাদীসকে ইমাম বুখারি বলেছেন 'সিলসিলাতুয যাহাব'। সেগুলো ইমাম মালিক ইবনু আনাসের রেওয়ায়েতে বর্ণিত। ইমাম মালিক বর্ণনা করেছেন আন নাফে (রহিমাহুল্লাহ) থেকে, আন নাফে বর্ণনা করেছেন ইবনু উমর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) থেকে, ইবনু উমর বর্ণনা করেছেন আল্লাহর রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে।

এটিই সিলসিলাতুয যাহাব। হাদীসের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য সনদ। এর চেয়ে

[২৫] তারতিবুল ইসলামিয়্যাহ, আল হিলইয়াহ

নির্ভরযোগ্য সনদ আর নেই।

ছাত্রবাৎসল্য

ইমাম মালিক ইবনু আনাসের (রহিমাহুল্লাহ) ছাত্র ছিল সারা দুনিয়া জুড়ে। বিশ্বের আনাচ-কানাচ থেকে মানুষ তাঁর কাছে ইলম আহরণ করতে আসতেন। কেনই বা তা হবে না?

ইমাম মালিকের একটি বিশেষ গুণ ছিল। প্রতি সপ্তাহে তাঁর বাড়িতে সকল ছাত্রকে খাবারের দাওয়াত দিতেন তিনি।

ইলমের আমানতদারি

ইমাম মালিক ইবনু আনাসের (রহিমাহুল্লাহ) শুধু জ্ঞানই ছিল না, তার সাথে ছিল প্রজ্ঞা ও প্রবল খোদাভীতি। তাঁকে যখন কেউ এমন কোনো ব্যাপারে প্রশ্ন করত যা ইতঃপূর্বে কেউ উত্তর দেয়নি, তিনি সাথে সাথে উত্তর দিতেন না। বলতেন, 'অপেক্ষা করো।' তারপর অজু করে আসতেন। এরপর বলতেন, 'লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।' তারপর দিতেন প্রশ্নের উত্তর।

মাসআলা সাধারণত দুই ধরনের হয়। কোনো কোনোটার উত্তর ইতোমধ্যে নির্ধারিত। যেমন অজু করার নিয়ম। আবার আরেক ধরনের মাসআলা নতুন উদ্ভূত। কুরআন ও সুন্নাহ ঘেঁটে নিজস্ব চিন্তা প্রয়োগ করে উত্তর দিতে হয় এগুলোর। এই দ্বিতীয় ধরনের প্রশ্নের উত্তর দেয়ার আগে অজু করে আসতেন ইমাম মালিক। উত্তর ভুল হয়ে যাওয়ার ব্যাপারে এতটাই ভয় করতেন আল্লাহকে।

মাসআলা সংক্রান্ত প্রশ্ন করা হলে কেঁদে দিতেন তিনি। বলতেন,

ما من شيء أشد علي من أن أسأل عن مسألة من حلال والحرام، لأن هذا هو القطع في حكم الله

'হালাল-হারাম বিষয়ক প্রশ্নের উত্তর আল্লাহ তাআলার হুকুমের অংশ। এ

সংক্রান্ত প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেয়ে কঠিন কাজ আর কিছুই হতে পারে না।'[২৬]

তিনি ভয় পেতেন যে, ভুলভাল ফতোয়া দিয়ে দিলে আল্লাহ তাআলার সামনে জবাবদিহি করতে হবে। নিক্ষিপ্ত হতে হবে জাহান্নামে। কিয়ামাতের দিন যখন আল্লাহ কাউকে জিজ্ঞেস করবেন, 'এটা করেছ কেন?' সে যদি উত্তরে বলে, 'ইমাম মালিক করতে বলেছিলেন, তাই।' এই ভয় তাঁকে কাবু করে ফেলত।

যেকোনো ফতোয়া দেওয়ার আগে তাই ইমাম মালিক ইবনু আনাস এই আয়াত তিলাওয়াত করতেন,

اِن نَّظُنُّ اِلَّا ظَنًّا وَّ مَا نَحنُ بِمُستَيقِنِينَ

'আমরা কেবল অনুমান করি এবং আমরা তো দৃঢ় বিশ্বাসী নই।'[২৭]

হাইসাম ইবনু জামিল (রহিমাহুল্লাহ) বলেন,

كنت ذات مرة مع الإمام مالك عندما سئل أكثر من أربعين سؤالًا، وسمعته يردُّ: لا أعرف إلى اثنين وثلاثين منهم.

'একবার ইমাম মালিকের ওখানে ছিলাম। এ সময় তাঁর কাছে চল্লিশটির বেশি প্রশ্ন আসে। দেখলাম যে, তিনি বত্রিশটি প্রশ্নের উত্তরেই "জানি না" বলে ফিরিয়ে দিয়েছেন।'[২৮]

সুনাম রক্ষার জন্য কখনও না জেনে ফতোয়া দেননি তিনি। নির্দ্বিধায় জানিয়ে দিতেন অপারগতার কথা। ইবনুল কাইয়িম আল জাওযি (রহিমাহুল্লাহ) তাঁর গ্রন্থ 'আর রায়ি'তে লিখেছেন,

لا أدري نصف العلم

'জানি না বলা জ্ঞানের অর্ধেক।'

আরও বহু সাহাবি, তাবিয়ি ও ফক্বিহর বক্তব্য রয়েছে এর স্বপক্ষে।

[২৬] তারতিবুল মাদারিক ওয়াতাক্বরিবুল মাসালিক, মালিক ইবনু আনাস ইমামু দারিল হিজরাহ।
[২৭] সূরা জাছিয়াহ (৩২)
[২৮] তারতিবুল মাদারিক ওয়াতাক্বরিবুল মাসালিক, তাযয়িনুল মামালিক।